বেঙ্গল টাইমস

bengaltimes.in

আমি যে গান গেয়েছিলেম

ISSN 2445 5657

সম্পাদকীয়

মহানায়কের পর এবার মহাগায়ক। উত্তম কুমারের পর কিশোর কুমার। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে উত্তম সংখ্যার পর এবার কিছুটা তাড়াহুড়ো করেই প্রকাশিত হল কিশোর সংখ্যা।

গানের জগতে এমন বর্ণময় চরিত্র আর ক'জন আছেন! এসেছিলেন অভিনয় করতে। সেখান থেকে হয়ে গেলেন গায়ক। তিনি যে আশির ওপর ছবি করেছেন, এই পরিচয়টাই ঢাকা পড়ে যায় গায়ক পরিচিতির কাছে। তাঁকে নিয়ে লিখতে গেলে বিষয়ের অভাব নেই। ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত তো আছেই। তাঁর মজার গল্পেরও শেষ নেই। কত বিতর্ক, কত রটনা তাঁকে ঘিরে। যার কোনওটা অতিরঞ্জিত, কোনওটা নিখাদ কাল্পনিক। এসব বিষয় বেশ মুখরোচক, সন্দেহ নেই। কিন্তু সচেতনভাবেই সেগুলিকে বিষয় হিসেবে আনা হয়নি।

একদিকে হিন্দি গানের দীর্ঘ যাত্রাপথ উঠে এসেছে, তেমনি বাংলা গানের ক্ষেত্রেও কিছু অজানা দিক তুলে আনার চেষ্টা হয়েছে। নানা আকর্ষণীয় তথ্যের সম্ভার যেমন আছে, তেমনি গানের আড়ালের কিছু গল্পও আছে। লতা মঙ্গেশকারকে দেওয়া তাঁর একটি সাক্ষাৎকারও তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে ধরা দিয়েছেন অন্য এক কিশোর।

চাইলে, শুধু কিশোরকে নিয়েই সংখ্যাটা হতে পারত। কিন্তু গত বেশ কয়েকটি সংখ্যায় অন্যান্য দিকগুলো কিছুটা উপেক্ষিত থাকছে। তাই, রাজনীতি, খেলা ও ভ্রমণের লেখাও রাখা হয়েছে। পড়ুন। ভাল লাগলে ছড়িয়ে দিন। আগামীদিনে আরও আকর্ষণীয় সংখ্যা নিয়ে হাজির হওয়ার প্রতিশ্রুতি রইল।

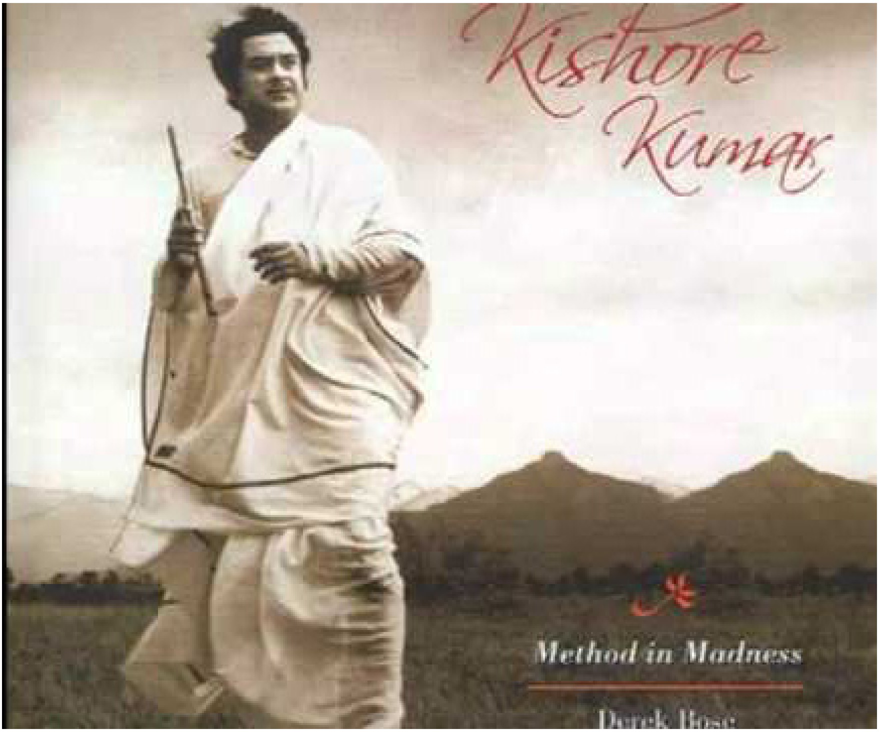

বঞ্চনা আর কিশোর যেন সমার্থক শব্দ

কখনও ক্ষমতার চোখরাঙানিকে পরোয়া করেননি। তাই রাষ্ট্রও মুখ ফিরিয়েই থেকেছে। জনতার হৃদয়ে, তবু রাষ্ট্রের কাছে তিনি যেন ব্রাত্যজন। তবে রুদ্ধসঙ্গীত নয়। গলা ছেড়েই গান গেয়েছেন। জোটেনি পদ্মশ্রীও। তাতে কী? মহাকালের বিচারে কে জয়ী ? লিখেছেন কুণাল দাশগুপ্ত।।

সেই কুস্তি আজও চলেছে। সাতের দশকের মাঝমাঝি সময় থেকে কেন্দ্রে বহু ধরনের সরকার এসেছে। জনতা, কংগ্রেস, বিজেপি, হরেক কিসিমের। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পনীতির মধ্যে প্রভেদ থাকলেও কিশোর কুমারের সঙ্গে ম্যারাথন যুদ্ধে কোনও পার্থক্য নেই। কিশোরে কুমারেরও কোনও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই। ৭৮ আর পি এম রেকর্ড থেকে শুরু করে হাল আমলের ইউটিউব, তৃতীয় গাঙ্গুলির গান মানুষের মস্তিস্কের কোষ থেকে কোষান্তরে ঘুরপাক খেয়েছে পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে। গান বিক্রেতার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বেড়েছে তাঁর গান বেচে। কপি সিঙ্গাররা সিঙ্গার হয়েছেন তাঁর গানে ঠোঁট মিলিয়ে। কিন্তু চলন্ত ট্র্যাডিশনে ব্রেক চাপা হয়নি। উপেক্ষার আরেক নাম যেন কিশোর কুমার।

চারের দশকের শেষার্ধে পথ চলা শুরু। শুরুতেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। মুম্বইয়ের স্পিনার পদ্মাকর সিভালকারের দশা হতে পারত কিশোর কুমারের।

সিভালকার প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি বেদি, চন্দ্রশেখর, প্রসন্ন, বেঙ্কট রাঘবনরা থাকায়। কিশোর কুমার যখন প্লে ব্যাক শুরু করলেন, তখন মুম্বইয়ের ময়দানে রয়েছেন তালাত মামুদ, মহম্মদ রফি, মান্না দে, হেমন্ত কুমার, মুকেশরা। এঁদের মধ্যে রফি, তালাত মামুদদের মারকাটারি বাজার। নৌশাদ, রোশন, শঙ্কর-জয়কিশেন ওপি নাইয়ারের মতো সঙ্গীত পরিচালকরা রফি, মান্নাতেই আসক্ত ছিলেন। শচীন দেববর্মণ অক্সিজেনটুকু না জোগালে প্রতিভার ডেথ সার্টিফিকেট লেখা হয়ে যেত সেই সময়েই।

কিছু নিজের ছবি আর কিছু দেবানন্দের, এই নিয়েই পাঁচের দশকের কিশোর কুমার। আর তারই মধ্যে পেইং গেস্ট, ফান্টুস জাতীয় ছবিতে গান হিট হয়েছে। কিন্তু দিলীপ কুমার, রাজ কাপুরের মতো নায়করা তো রফি, মুকেশ বা তালাতেই আটকে ছিলেন। গোটা পাঁচের দশকে হাতে গোনা কিছু গান গেয়েছিলেন কিশোর কুমার। ছয়ের দশকেও খুব একটা ভাল যায়নি কিশোর কিশোর

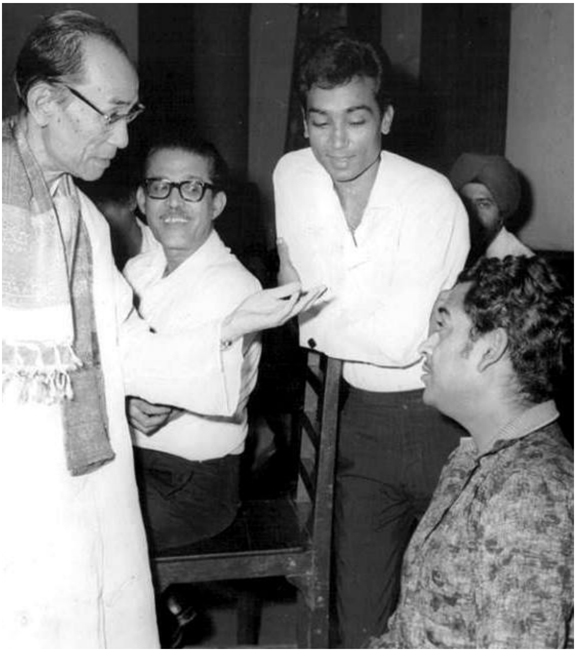

কুমারের। শঙ্কর- জয়কিষেন, শাম্মি কাপুরের জুটি মার্সিডিজ বেঞ্চের মতো দৌড়েছে। সঙ্গে মহম্মদ রফি। রাজ কাপুর মজেছিলেন মুকেশে। মাঝে মান্না দে। দিলীপ কুমার তালাত থেকে সরে গিয়ে রফিতে ডুব দিলেন। সবেধন নীলমণি সেই দেবানন্দ। তাঁর গানে আবার ভাগ বসাতেন রফি, হেমন্ত কুমার। তাই এই সময়টাতেও ভরসা শচীন কর্তা। এমনকি রাহুল দেব বর্মণও তাঁর প্রথম ছবি ছোটে নবাব- এ কিশোরকে নিতে সাহস করেননি। 'শ্রীমানজি' সুপার ডুপার হিট। কিন্তু সেখানেও তো কিশোর কুমার নেই। কিশোর কুমারকে ৬৯ সাল পর্যন্ত রাহুল দ্রাবিড় হয়ে থাকতে হয়েছে। বাঁ পা বাড়িয়ে রক্ষণাত্মক খেলা। অন্য দিকে গোকুলে বেড়ে চলেছিলেন রাজেশ খান্না। শক্তি সামন্তের আরাধনা মুক্তির পর কিশোর- -রাজেশ জুটি মনে করাল পেলে-গ্যারিঞ্চাকে।

সেলুলয়েডের বাইরের পরশ পাথর। সফর, সচ্চা ঝুটা, অমর প্রেম, কটি পতঙ্গ বক্স অফিসে বিপ্লব ঘটিয়েছে। সঙ্গীত পরিচালকরাও লাইন লাগানো শুরু করলেন মুম্বইয়ের গৌরীকুঞ্জের সামনে। কে নেই সেই লাইনে? শঙ্কর-জয়কিষেণ,

মদন মোহন, ওপি নাইয়ার, লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল, কল্যাণজি- আনন্দজি, আর পিতা পুত্র দুই বর্মণ তো ছিলেনই।

নায়কদের মধ্যে যাঁরা মহম্মদ রফিকেই পছন্দ করতেন, তাঁরাও তখন কিশোর কণ্ঠের জন্য আকূল। এই দলে ছিলেন দিলীপ কুমার, শশী কাপুর, ধর্মেন্দ্র, জিতেন্দ্রর মতো তাবড় অভিনেতারা। সাতের দশকের মাঝামাঝি। ভারত জুড়ে কিশোর ঝড়। অন্য দিকে রাজনৈতিক অচলাবস্থা। চলছে জরুরি অবস্থা। ইন্দিরা তনয় সঞ্জয় গান্ধীর বিনা পয়সায় গান গাওয়ার হুকুম উড়িয়ে দিলেন কিশোর কুমার। রেডিওতে নিষিদ্ধ হল কিশোর কুমারের গান। ইথার তরঙ্গের দরজা বন্ধ কিশোর কণ্ঠের জন্য। এই নিষেধাজ্ঞা অবশ্য খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। সাতাত্তর সালে মোরারজি দেশাইয়ের সরকার আসার পর রেডিওতে আবার বাজতে থাকে কিশোর কুমারের গান।

কিন্তু প্রকৃত সম্মান পেলেন কোথায় ? হিট গানের সংখ্যা তো কারও থেকে কম নয়। পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী বলেছেন, কুছ তো লোগ কহেঙ্গের মতো গান সবাই গাইতে পারেন না। তবু কোনও গান রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেল না। অথচ, ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার তিনি বহুবার পেয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কোনও পুরস্কার বা স্বীকৃতি জোটেনি এই শিল্পীর। তাঁর সমসাময়িক প্রায় সবার নামের আগে ‘পদ্মশ্রী’ বসেছে । পরবর্তী প্রজন্মে তো ঝুড়ি ঝুড়ি পদ্মশ্রী। তিনি কিন্তু বঞ্চিতই। এমন অনেক গান আছে, যেগুলো কিশোর কুমারের সঙ্গে তাঁরাও গেয়েছেন। কিন্তু মানুষ গ্রহণ করেছে কিশোরের গানকেই। যেমন তুম বিন যাঁউ কাঁহা। রফিও গেয়েছেন। কিন্তু হিট কিশোরের গলাতেই। সমঝোতা গমো সে কর লো লতা মঙ্গেশকার ও গেয়েছেন। মানুষ নিয়েছেন কিশোর কুমারকেই। জিন্দেগি এক সফর আলাদা করে গাইলেও হিট কিশোরেরটাই।

সবকিছুর পরেও বঞ্চনাই অমরত্ব লাভ করেছে। মৃত্যুর তিন দশক বছর পরেও কিশোর কুমারকে মরণোত্তর সম্মান জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি কেন্দ্রের সরকার। এই জায়গায় কংগ্রেস বা বিজেপি-র মধ্যে তেমন কোনও ফারাক চোখে পড়ে না। এখন বেঁচে থাকলেই বা কী হত! বড়জোর একগুচ্ছ সরকারি তাঁবেদারের সঙ্গে বঙ্গভূষণ জুটত। কিশোর কুমার তাঁবেদারি করেননি কোনও সরকারের। সঞ্জয় গান্ধীর লাল চোখ উপেক্ষা করেছেন। ফলে সঞ্জয় পন্থীদের তো বটেই, তাঁর উল্টোদিকের শিবিরের কাছেও অপ্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন। এটা হচ্ছে এই মহান দেশের জটিলতম অঙ্ক। বাম, অতি বাম, ডান, অতি ডান একসঙ্গে সকলের চক্ষুশূল হয়েছিলেন বোধ হয় কিশোর কুমার। তারই ফল এই অন্তহীন অবজ্ঞা। সাতের দশকের মাঝামাঝি শিল্পী বনাম রাজনীতিকের যে কুস্তি শুরু হয়েছিল, সেই কুস্তি আজও চলেছে।

একই গান, কিন্তু টেক্কা দিয়ে গেছেন অন্যদের

একই গান। কিশোর গেয়েছেন, অন্যরাও গেয়েছেন। কিন্তু রফি, লতা বা আশা নয়, মহাকালের বিচারে শেষমেষ থেকে গেছে কিশোরের গানটাই। মানুষ 'অশিক্ষিত' গায়কের গানকেই বুকে ঠাঁই দিয়েছেন। এমনই অনেক গানের কথা তুলে ধরলেন কুণাল দাশগুপ্ত।

স্টিফেন হকিংয়ের সৌজন্যে ব্রহ্মাণ্ড রহস্য হাতের মুঠোয় এলেও এ রহস্যের দূরত্ব কয়েক আলোকবর্ষ। সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের স্নায়ুতন্ত্র বিবস হয়ে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসাচিহ্ন অমরত্ব লাভ করে জ্বলজ্বল করে চলেছে প্রশ্নটির পাশে। কেন কোনও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার না পাওয়া এক 'অশিক্ষিত' গায়কের সঙ্গে দৌড়ে বারে বারেই পিছিয়ে পড়তে হয়েছে সারেগামা গুলে খাওয়া শিল্পীদের? মহম্মদ রফি, লতা মঙ্গেশকার, আশা ভোসলে, পরভীন সুলতানাদের কীভাবে কৃশাণু দে সুলভ ড্রিবলিংয়ে বারেবারেই টপকে গিয়েছিলেন কিশোর কুমার।

ট্যান্ডাম সং-এ (একই গান যখন দুই ভিন্ন শিল্পী গায়) দেখা গিয়েছে কিশোর কুমার তাবড় তাবড় শিল্পীদের থেকে জনপ্রিয়তায় কয়েক যোজন এগিয়ে থেকেছেন। কখনও বা অন্যজনের জামানত জব্দও হয়ে গিয়েছে। 'প্যার কা মৌসম' ছবির কথাই ধরা যাক। 'তুম বিন যাউ কাঁহা' কিশোর কুমার এবং মহম্মদ রফি দুজনেই গেয়েছিলেন । কোনও সন্দেহ নেই, কিশোর কণ্ঠ এখানে অনেকটাই এগিয়ে। তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে, 'একদিন পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে'র সুরে গাওয়া এই গান রাহুল দেব বর্মণ কিশোর কুমারকে ভেবেই তৈরি করেছিলেন। তাহলে মুনিমজি ছবি 'জীবন কে সফর মে রাহি'র ব্যাখ্যা কী হবে ? এখানে লতা মঙ্গেশকার প্রায় নক আউটই হয়ে গিয়েছেন। লতাকে কিশোর কুমার ছাপিয়ে গিয়েছিলেন সমঝোতা ছবির 'সমঝোতা গমো সে করলো' 'শর্মিলি' ছবির

‘খিলতেহে গুল ইঁহা’তেও। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা গিয়েছে ‘মেহেবুবা’তেও। সেখানে শিবরঞ্জনি রাগের উপর গাওয়া কিশোর কুমারের ‘মেরে নয়না শাওন ভাদো’র জনপ্রিয়তাও প্রশ্নাতীততভাবে লতার থেকে বেশি। আবার মঞ্জিল ছবিতে ‘রিম ঝিম গিরে সাওন’ কিশোর, লতা দুজনেই গেয়েছেন। যথারীতি তৃতীয় গাঙ্গুলি ওভার বাউন্ডারি মেরে দিয়েছে। একই কথা খাটে সওতন ছবির ‘জিন্দেগি প্যার কা গীত হ্যায়’ গানের ক্ষেত্রেও।

কিশোর কুমার টেক্কা দিয়েছিলেন আশা ভোসলেকেও। সেই আশা ছবিতে। ‘ইনা মিনা ডিকা’ গানে কিশোর কুমার পিছনে ফেলে দিয়েছিলেন আশা ভোঁসলেকে। আবার আন্দাজ ছবিতে ‘জিন্দেগি এক সফর হ্যায় সুহানা’ গানটির দশা ১৯৭৫ সালের শিল্ড ফাইনালের মতোই। কিশোর কুমার পাঁচ গোল চাপিয়ে দিয়েছিলেন আশাকে। আশার গলায় ইওর লিং সেদিন নিতান্তই বেমানান লেগেছিল। মুকাদ্দর কা সিকান্দর ছবির কথাই ধরা যাক। ‘ও সাথীরে, তেরে বিনা ভি ক্যা জিনা’ গানটি কিশোর-আশা দুজনেই গেয়েছেন ? আশার সেই গান কজন শুনেছেন ? বাংলা ছবি জীবন মরনে ‘আমার এ কণ্ঠ ভরে’ গানটিতেও আশা কিশোরের থেকে পিছিয়ে ছিলেন জনপ্রিয়তার দৌড়ে।

‘কী আশায় বাঁধি খেলাঘর’ কার গান? সবাই একবাক্যে বলবেন কিশোর কুমারের কথা। কিন্তু ঘটনা হল, তারও অনেক আগে রেডিওতে গানটি রেকর্ড করেন শ্যামল মিত্র। অমানুষ ছবিতে সেই শ্যামলই ছিলেন সুরকার। ভোর হয়ে আসার মুহূর্তে নৌকার পাটাতনে দাঁড়িয়ে উপযুক্ত কোনও গান খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তখন নিজের রেকর্ড করা সেই পুরানো গানটাই গাইয়ে ছিলেন কিশোর কুমারকে দিয়ে। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া একটা গান যেন অমরত্ব পেয়েছিল কিশোরের গলায়।

এক্কেবারে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী পারভিন সুলতানাকেও পরাজয়ের এমন তিক্ত স্বাদ পেতে হয়েছিল। কুদরত ছবিতে ‘হামে তুমসে প্যার কিতনা’ গানটি কিশোর ও পারভিন দুজনেই গেয়েছিলেন। পারভিন সুলতানার ক্লাসিকাল টাচ ইনিংস ডিফিট খেয়েছিল কিশোর কুমারের সাদামাটা গলার কাছে। এবার সেই মোক্ষম প্রশ্ন, কেন ? উত্তর অজানা। কেমন করে রবি ঠাকুর তাঁর প্রতিভার ফুল ফোটাতেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জানতে চেয়েছিলেন সুকান্ত। আমরাও অশিক্ষিত গলার জনমনে এমন মনোপলির কারণ খুঁজে চলেছি। ষড়যন্ত্রের থেকে হৃদযন্ত্র বেশি গুরুত্ব পেত বলেই কি ? উত্তর জানা নেই। জিজ্ঞাসা চিহ্ন অবিনশ্বর।

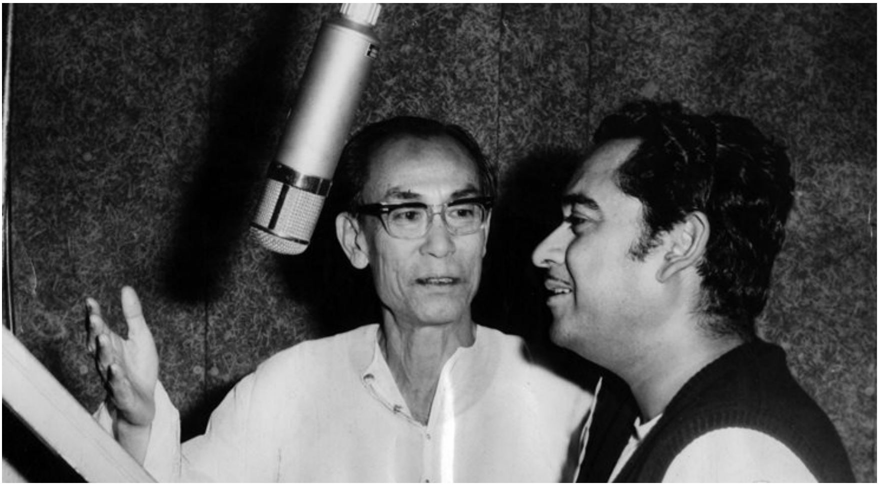

কিশোর নন, বঞ্চিত বেচারা ফিল্মফেয়ার

রাষ্ট্রের কাছে কিশোর ছিলেন ব্রাত্য। কিন্তু ফিল্মফেয়ার! হিসেবে বলছে, আটবার এই পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু যে গানগুলোর জন্য পেলেন, আর যে গানগুলোর জন্য পেলেন না, তা একবার মিলিয়ে দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন, ফাঁকিটা কোথায়। বছর ধরে ধরে, সেই হিসেবটাই মেলে ধরলেন পরিচয় গুপ্ত।।

ঠিক ভিভ রিচার্ডসদের মতোই। তাঁর সেরা সময় ভিভ যেমন উইলো দিয়ে ছেলেখেলা করতেন, কিশোর কুমারও ভোকাল কর্ড দিয়ে করতেন সুরের জাগলিং। তবু ভারত নামক ভূখণ্ডের প্রভুরা তাঁর জন্য কোনও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বরাদ্দ করেননি।

কিশোর কুমার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার অবশ্য সবথেকে বেশি পেয়েছিলেন। ৮ বার। সবথেকে বেশি মনোনয়নও পেয়েছেন কিশোর কুমার। ২৭ বার। একই বছরে সবচেয়ে বেশি মনোনয়ন পেয়েছেন কিশোর কুমারই, চারবার। এই তথ্য দেখে যদি মনে হয়, ফিল্মফেয়ার পত্রিকাগোষ্ঠী তৃতীয় গাঙ্গুলির উপর নিদারুণ সদয় ছিলেন, তাহলে আপনি ভগবৎ চন্দ্রশেখরের গুগলির সামনে পড়লেন।

কিশোর কুমার ১৯৪৮ সাল থেকে প্লে ব্যাক করছেন। উল্লেখ্য, ১৯৫৯ সাল থেকে সেরা প্লে ব্যাক সিঙ্গার বাছার কাজটা শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ শিঁকেটি ছিড়তে সময় লেগেছিল ১১ বছর। ১৯৭০ সালে ‘আরাধনা’ ছবির ‘রুপ

তেরা মস্তানা'র জন্য প্রথম ফিল্মফেয়ার পান কিশোর। এরপর পাক্কা ছয় বছর পর দ্বিতীয়বার সেরা গায়ক হন, অমানুষ (হিন্দি) ছবিতে 'দিল অ্যায়সা কিসিনে মেরা তোড়া' গাওয়ার জন্য।

তৃতীয়বার পেলেন ১৯৭৯ সালে ডন ছবির 'খাইকে পান বানারসওয়ালা'তে। 'থোড়ি সি বেওয়াফাই' ছবিতে লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে হাজার রাহে' গেয়ে চার নম্বর ফিল্ম ফেয়ারটি পেয়েছিলেন। ১৯৮৩ সালে, পান 'পগ ঘুঙরু'র জন্য। ঠিক পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৮৩ সালে 'আগর তুম না হোতে' টাইটেল সঙ গেয়ে ছয় নম্বর পুরস্কারটি হাসিল করেন কিশোর। সাত নম্বরটি পান 'শরাবি' ছবিতে 'মনজিলে আপনি জাগা'। আর সব শেষে সাগর-এর টাইটেল সঙ। বেয়াড়া প্রশ্নটি হল, পেলেন তো এইসব গানের জন্য। কিন্তু কোন কোন গান গাওয়ার পরেও কিশোর কুমার পুরস্কার পেলেন না।

১৯৭১ সালে 'প্যাহেচান' ছবিতে 'সবসে বড়া নাদান' ছবির জন্য মুকেশ ফিল্ম ফেয়ার পান। কোনও সন্দেহ নেই যে, বিশাল বড় শিল্পী

ছিলেন মুকেশ। কিন্তু 'সবসে বড়া নাদান'-গানটিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হননি। বলা যেতে পারে, স্টুডিও থেকে বেরিয়েই মুখ থুবড়ে পড়ে প্যাহেচান ছবির গান। অবাক কাণ্ড কিশোর কুমারের কোনও গানই নমিনেশন পায়নি সেই বছর।

১৯৭২ সালে এই পুরস্কার পান মান্না দে। এ ভাই জরা দেখকে চলো। ছবি— মেরা নাম জোকার। কিশোর কুমারের 'কটি পতঙ্গ'-এর 'ইয়ে যো মহাব্বত হ্যায়' নমিনেশনে ছিল। জনপ্রিয়তা এবং গানের মানের বিচারে কোনটা এগিয়ে, তা নিয়ে বিতর্ক থাকবেই। রাজ কাপুরের অদৃশ্য হাত হিন্দি ছবির জগতে অনেক অনিষ্ট করেছে। এক্ষেত্রে সেটাই কাজ করেছে কিনা, তা গবেষকরাই বলতে পারবেন। আমরা আমজনতা বলতে পারি, কিশোর কুমারকে পত্রিকাগোষ্ঠী পিছন থেকে কাঁচি মেরেছিলেন। রেফারি নেই, ফাউল কে দেবে!

১৯৭৩ সাল। পুরস্কার পেলেন মুকেশ। গানের নাম-জয় বোলো বেইমানকি। ছবি: শোর। পেল না নমিনেশনে থাকা 'অমর প্রেম' ছবিতে অমর শিল্পীর অমর গান 'চিঙ্গারি কোই ভড়কে।' নমিনেশনই পেল না 'কুছ তো লোগ কহেঙ্গে'। ফিল্মি দুনিয়ায় অসৎ মানুষের আনাগোনা বেশি হলে সঙ্গীতের সঙ্গে বেইমানি করাটা সহজ হয়ে যায়। সেই কারণেই ঘুরে ফিরে জয় জয়কার হয়েছে 'জয় বোলো বেইমানকি'র মতো কূলগোত্র হীন গানের।

১৯৭৫ সালে মহেন্দ্র কাপুর

পেলেন ফিল্ম ফেয়ার। গাইলেন, 'রোটি কাপড়া আউর মকান' এ 'অউর নেহি, অউর নেহি, বাস অউর নেহি'। কী কাণ্ড! ওই বছরই কিশোর কুমারের মেরা জীবন কোরা কাগজ' নমিনেশন পায়। কিন্তু ভাল গানের জন্য পুরস্কার অধরা। ১৯৭৭ সালে আবার মুকেশ ফাটালেন। কভি কভি-র টাইটেল সঙ গেয়ে। কিশোর কুমারের 'মেরে নয়না সাওন ভাদো' নমিনেশন পেলেও বিচারকদের সততা বা অতি পাণ্ডিত্যের জন্য বঞ্চিত হতে হয়েছে। এমনভাবেই ১৯৭৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত নমক হারাম-ছবিতে গাওয়া 'ম্যায় শায়ার বদনাম' কিশোর কণ্ঠকে পুরস্কার দিতে ব্যর্থ।

নমিনেশন, ইলেকশন বা সিলেকশন বলিউডে কোনওদিন 'ফেয়ার' ছিল না। তাই ফিল্ম-ফেয়ার পুরস্কার চিরদিনই ফেয়ারনেস-এর অভাবে ভুগেছে। ভাবা যায়, কিশোর কুমারের 'জিন্দেগি কা সফর', 'জিন্দেগি কে সফর মে গুজর' কিম্বা 'কিসকা রাস্তা দেখে' নমিনেশন পর্যন্ত যেতে পারেনি! কিশোর কুমার লাগাতার ফিল্মফেয়ার পেতে শুরু করলেন যখন মুকেশ -রফি প্রয়াত হয়েছেন। ফিল্মি দুনিয়া থেকে অনেকটাই সরে গেছেন মান্না দে। তখন পিঠ বাঁচাতে নিম্নমানের গানের জন্য কিশোরকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। যেগুলোকে কিশোরের সেরা গানের তালিকাতেই রাখা যায় না।

মিথ আছে, নামী সুরকাররা নাকি ফিল্মফেয়ার কিনে নিতেন। শোনা যায়, অভিমান পুরস্কৃত হওয়ার পর স্বয়ং এসডি বর্মন নাকি শঙ্কর জয়কিশেনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কিছুটা অভিমানবশত এই কেনাবেচার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

যাই হোক, বাঙালিদের নামের পেছনে কুমার যোগ থাকলেই হিস্টামিন সিক্রেশন হেরে যেত। প্রবল অ্যালার্জি যাকে বলে। প্রয়াত কিশোর কুমারের সঙ্গে অন্তহীন কুস্তি চললেও জনগণের মনের রিঙ-এর বাইরে ছিটকে ফেলতে পারেননি ছিচকেরা। সাহিত্য, বিনোদন ও শিল্পের জগতে একজন বিচারকের কথা খুব শোনা যায়— মহাকাল। তার বিচারে যে টেকার, টিকে যায়। যে হারানোর, সে হারিয়েও যায়। সেখানে রাষ্ট্রের ফতোয়া, প্রভাবশালীর প্রভাব, এগুলো ধোপে টেকে না। আটটা ফিল্ম ফেয়ার তাই বোকা বানানোর প্রচেষ্টা মাত্র। আর আপনি যদি আটখানা ফিল্ম ফেয়ার-এর জন্য আহ্লাদে আটখানা হন, তাহলে পিছনে তাকিয়ে দেখবেন, আপনার স্টাম্প নড়ে গিয়েছে। এঁরা ভগবৎ চন্দ্রশেখরের চেয়েও ভয়ঙ্কর যে!

লোকে যতটা পাগল ভাবে, অতটা পাগলও নই

মুখোমুখি দুই কিংবদন্তি। কিশোর কুমারের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন লতা মঙ্গেশকার! না, কাল্পনিক ঘটনা নয়। সত্যিই এমনটা হয়েছিল। কিশোর কুমারের জন্মদিনে সেই সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ উঠে এল বেঙ্গল টাইমসে।

ক্রমশ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছিল। ফিল্মি দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কই চুকিয়ে দিতে চাইছিলেন। মিডিয়া থেকেও দূরে দূরেই থাকতেন। ঠিক করেই নিয়েছিলেন, বম্বে ছেড়ে চলে যাবেন গ্রামের বাড়ি খান্ডোয়ায়। যেই বাড়িতে যাচ্ছে, ফিরিয়ে দিচ্ছেন, নয়তো লুকিয়ে যাচ্ছেন। সাক্ষাৎকার! পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। শর্ত দিলেন, 'একমাত্র লতা মঙ্গেশকার যদি সাক্ষাৎকার নেয়, তবেই সাক্ষাৎকার দিতে পারি।' লতাকে বলা হল এই কঠিন কাজটির দায়িত্ব নিতে। লতা এলেন। একথা - সেকথায় সময় গড়িয়ে গেল। কোথাও খুনসুটি। আবার কোথাও বেরিয়ে এল চাপা এক যন্ত্রণা। সব মিলিয়ে সেই আড্ডার টুকরো কিছু মুহূর্ত উপভোগ করুন।

লতাঃ কিশোরদা, আপনি কখনও অভিনেতা, কখনও পরিচালক। কখনও সুর দিচ্ছেন। কখনও লিখছেন। আবার কখনও গাইছেন। এত কাজের মাঝে কোনটা করে বেশি তৃপ্তি পান?

কিশোরঃ আমি যখন একেবারে ছোট, তখন থেকেই আমার প্রিয় হল গান। শুরু থেকেই একজনকে গুরু বলে মেনেছি। এখনও তাঁকেই গুরু বলে মনে করি। তিনি কুন্দনলাল সায়গাল।

লতাঃ উনি আমারও গুরু।

কিশোরঃ তাহলে তুমি বুঝবে। সঙ্গীতই আমার জীবনে প্রথম প্রেম। আর অ্যাক্টিং তো অনেক পরে এসেছে । ওটা আমি করতেও চাইনি। আমার বড় দাদা অশোক কুমারের পাল্লায় পড়ে করতে হয়েছিল। দাদা বলল, তুই অ্যাক্টিং কর। আমি বললাম, আমাকে দিয়ে ওসব করিও না। অ্যাক্টিং মানেই কেমন যেন বানানো। আর সঙ্গীত বেরিয়ে আসে মানুষের হৃদয় থেকে। হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসা গানই মানুষের হৃদয়ে পৌঁছতে পারে। বরাবর এটাই মনে করে এসেছি। আর তাই গানই আমার প্রিয়।

লতাঃ আপনাকে নিয়ে লোকের অনেক দুশ্চিন্তা । আপনি কথা দিয়েও নাকি অনুষ্ঠানে যান না! এরকম একটা প্রচার আছে।

কিশোরঃ কেন যে লোকে এসব কথা ছড়ায়, বুঝি না। যারা আমাকে ভালোবাসে, তারাও বলে। যারা সহ্য করতে পারে না, তারা তো বলেই। অথচ, আমি জানি, লোকে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তাদের আমি হতাশ করতে পারি না। আমি কথা দিলে অনুষ্ঠানে যাই,

আগামী দিনেও যাব। কিন্তু এই রটনাকে কে থামাবে?

লতাঃ কিন্তু এত লোক থাকতে আপনাকে নিয়েই এসব রটনা কেন?

কিশোরঃ দুনিয়া ক্যাহেতা মুঝকো পাগল। ম্যায় ক্যাহতা দুনিয়া কো পাগল। আসলে আমাকে পাগল ভেবে বা পাগল প্রচার করে কেউ কেউ বেশি আনন্দ পায়। আরে বাবা, আমাকে যতখানি পাগল ভাবে, আমি ততখানি পাগল কিন্তু নই। তবু লোকে যখন পাগল ভাবে, মজাই পাই। তখন মনে হয়, এ যখন পাগল ভেবেই নিয়েছে, তখন আরও বেশি করে পাগলামি করি।

লতাঃ এতদিন ধরে গাইছেন। এত সুরকারের সঙ্গে কাজ করেছেন। কার সঙ্গে কাজ করে সবথেকে ভাল লেগেছে?

কিশোরঃ একেবারে শুরুর দিককার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। প্রথমেই করতে হবে খেমচাঁদ প্রকাশের নাম। তোমার আর আমার পরিচয় তো ওখানেই। তোমার মনে আছে? তুমি ট্রেনে উঠলে, আমিও উঠলাম। তুমি আমার দিকে তাকালে, আমিও তাকালাম। তুমি নামলে, আমিও নামলাম। তুমি টাঙ্গায়, আমিও উঠলাম। তুমি বম্বে টকিজের গেটে গেলে, আমিও গেলাম। তুমি ভাবছিলে, এ আবার কে পিছু নিচ্ছে। তারপর আমরা আলাদা হয়ে গেলাম। তুমি গাইছিলে মহল ছবিতে, আর আমি জিদ্দিতে। সেই ওঁর সঙ্গে কাজ করা শুরু। আমার দাদামণি অশোক কুমার বরং আমাকে নিরুৎসাহিত করতেন। বলতেন, তোর গলায় মডিউলেশন ঠিক হচ্ছে না। উনি কেমন গাইতেন, তুমি

তো জানো (বলেই অশোক কুমারের গলা নকল করে গেয়ে ফেললেন। উল্টোদিকে লতা তখন হেসে চলেছেন।) কিন্তু বড় দাদা, কী বলি বলো তো! ঠিক আছে, বলছে বলুক। কিন্তু আমাকে যা উৎসাহ দেওয়ার খেমচাঁদজি দিয়েছি-লেন। উনি তখন দাদা-মণিকে বললেন, দেখো অশোক , এই ছেলেকে আমার কাছে ছেড়ে দাও। আমি একে তৈরি করে নেব। এভাবেই উনি গান গাইয়েছেন। আমার এগিয়ে আসার পেছনে তাঁর বিরাট ভূমিকা। তারপর এস ডি বর্মন সাব। উনি একেবারেই আলাদা মানুষ। যেখানেই গাইতে সমস্যা হচ্ছে, বুঝতে পারতেন। বলতেন, গাইতে অসুবিধা হচ্ছে? বদলে দেব? আমি করুণভাবে তাকিয়ে বলতাম, বদলে দিলে ভাল হয়। উনি তখন সুর বদলে দিতেন।

লতাঃ সব সময় পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান কেন?
কিশোরঃ কেন জানি না। ঠিক মনিয়ে উঠতে পারি না। তাই ইচ্ছে মতো পালিয়ে বেড়াই। গানের নামে যা সব চলছে, মেনে নিতেও পারি না। আগের মতো সেই গান কোথায়? তুমি বলো, আগে গান গাওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ ছিল না! তুমি তো আরও ভাল জানবে। তুমি আমার আগে থেকে গাইছো। আমি তো তোমার কাছে কিছুই নই। আমি এই বুড়ো বয়সেও হারমোনিয়াম জানি না। সা রে গা মা মা পা ধা নি কিছুই জানি না। কিন্তু পাবলিক এসব বিশ্বাস করতেই চায় না। আচ্ছা লতা, তুমি তো জানো, আমি এসব কিছুই জানি না। তুমি ওই লোকগুলোকে একটু বুঝিও প্লিজ।

লতাঃ কিশোরদা, আমার সঙ্গে অনুষ্ঠান করতে আপনার কেমন লাগে? সত্যি বলবেন কিন্তু।
কিশোরঃ কী বলি বলো তো! আমার তো দারুণ লাগে। তবে মাঝে মাঝে খুব ভয় হয়। তুমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শান্ত হয়ে গান গাও। আর আমি মঞ্চে লাফালাফি করি। মাঝে মাঝে আড়চোখে তোমাকে দেখি, তুমি আবার রেগে যাচ্ছো না তো!

লতাঃ আমার একটুও খারাপ লাগে না। বরং, আমার নিজের মধ্যে একটা সমস্যা আছে। আমি এদিক ওদিক যেতে যেতে গান করতে পারি না।
কিশোরঃ না, না। আমার মতো তুমি কেন করতে যাবে? তুমি যা করো, একেবারে ঠিক করো। আসলে, আমি আগে আক্টিং করতাম তো। লাফালাফিটা একরকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। দর্শকরাও বোধ হয় আমার কাছে তেমনটাই চায়। তাই গান করি, সঙ্গে একটু লাফালাফিও করি। দর্শকদের ডাবল আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করি।

লতাঃ শোনা যাচ্ছে, আপনি নাকি বম্বের পাট চুকিয়ে গ্রামের ফিরতে চাইছেন । আর নাকি প্লে ব্যাক করবেন না। হঠাৎ কী এমন হল যে পালিয়ে যেতে চাইছেন?

কিশোরঃ দেখো লতা, আমি জীবনের অনেক চড়াই উতরাই দেখেছি। আজ নিজের চেষ্টায়, অনেকের সাহায্যে একটা জায়গায় এসেছি। অভিনয় করে, গান করে অনেক মানুষকে আনন্দ দিয়েছি। নিজেও অনেককিছু পেয়েছি। আর কীই বা চাওয়ার থাকতে পারে! খারাপ সময় আসার আগে নিজে থেকে সরে যাওয়াই ভাল। জীবনের এমন সময় ডেকে আনতে চাই না, যেখানে লোকে করুণা করবে। তাছাড়া, যত বয়স বাড়ছে, তত বেশি করে এই শহর থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। ততই নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে।

লতাঃ আপনি নিজেই বললেন, সঙ্গীত আপনার প্রথম প্রেম। আপনার যন্ত্রণা বুঝি। আপনি সিনেমা ছাড়তে পারেন। প্লেব্যাক ছাড়তে পারেন। কিন্তু গান ছাড়তে পারবেন? কষ্ট হবে না?

কিশোরঃ গান কি ছাড়তে পারি! ছাড়ব কেন? টাকা পয়সার দরকার নেই। গান গেয়ে মানুষকে আনন্দ দেব। তুমিও তো চ্যারিটি করো। আমিও করব। ডাকলেই হাজির হয়ে যাব।

লতাঃ কিশোরদা, আমরা দুজন একসঙ্গে যদি এই কাজটা করি!

কিশোরঃ খুব ভাল হয়। একসঙ্গে ভাল কাজ করার আনন্দই আলাদা। তুমি যখন ডাকবে, আমাকে পাবে। যত দিন বেঁচে আছি, তোমার একডাকেই হাজির হয়ে যাব।

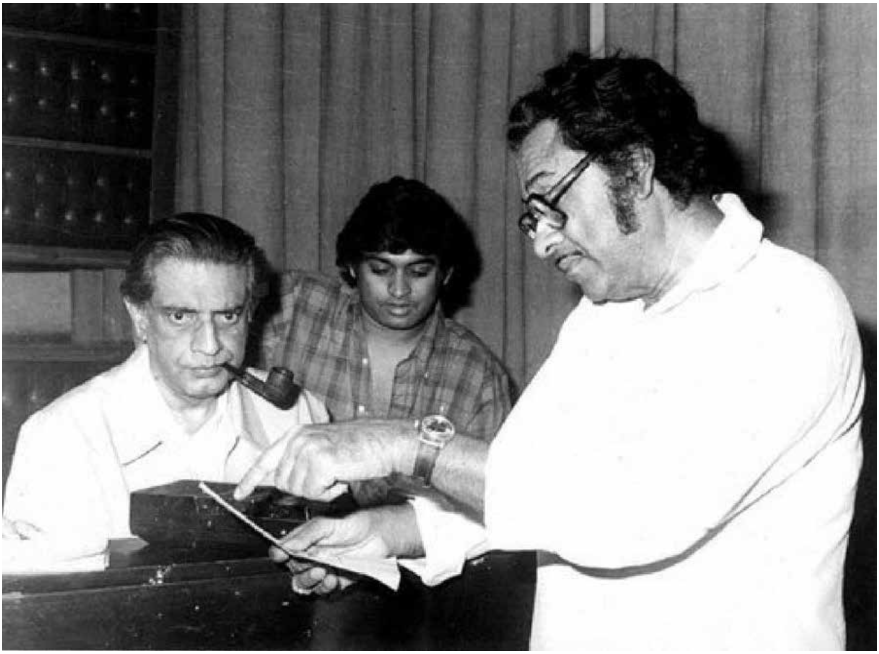

কিশোরের কণ্ঠে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারত রবি ঠাকুরের গান

রবীন্দ্র চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার বদলে রবীন্দ্রনাথকে বন্দি রাখার কাজটাই করেছে বিশ্বভারতী। একজন কিশোর কুমার থাকতেও তাঁকে কাজে লাগাতে পারেনি। তাই রবি ঠাকুর বিশ্বকবি তো দূরের কথা, জাতীয় কবিও হতে পারেননি। বাঙালি হয়েই থেকে গিয়েছেন। লিখেছেন স্বরূপ গোস্বামী।

হরিয়ানার কোনও কিশোর কি রবি ঠাকুরের গান গেয়ে প্রেম নিবেদন করে? মহারাষ্ট্রের কোনও বৃদ্ধ কি একাকী কোনও বিকেলে রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে ওঠেন? বা ধরুন, মণিপুরের কোনও যুবতী। প্রেম ভেঙে যাওয়ার যন্ত্রণায় কি রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার নতুন দিশা খুঁজে পান?

হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র বা মণিপুরের কথা টেনে আনা হল। তার জায়গায় ভারতের অন্যান্য রাজ্যের কথাও আসতে পারত। বয়স বা চরিত্রগুলোও বদলে যেতে পারত। পরিস্থিতিটাও হয়ত অন্যরকম হতে পারত। বিরহের বদলে পূর্বরাগ, প্রেমের বদলে যন্ত্রণা, একাকিত্বের বদলে

জনসমুদ্র। সহজ কথা, তাঁদের চিন্তায়–চেতনায়–যাপনে রবি ঠাকুরের অস্তিত্ব কতটুকু?

একদিকে আমরা রবীন্দ্রনাথ-কে বিশ্বকবি বলি। অন্যদিকে তাঁকে ভারতীয় হতে দিইনি। বাংলার গণ্ডিতেই আটকে রেখেছি। রবি ঠাকুর অনেক আক্ষেপ করে একটা কবিতায় লিখেছিলেন, ‘রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করোনি।’ কে জানত, তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও কথাটা এমন ভাবে মিলে যাবে? আমরা, গায়ের জোরে তাঁকে বাঙালি করেই রেখে দিয়েছি। জাতীয় কবি বা বিশ্বকবি হতে দিইনি। আর এই ব্যাপারে সবথেকে বেশি যদি কাউকে অভিযুক্ত করতে হয়, তবে সেটা বিশ্বভারতী। কবিগুরুর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানই তাঁর চিন্তা-–চেতনাকে ছড়িয়ে দেওয়ার পথে সবথেকে বড় বাধা হয়ে উঠেছিল।

জাপানের কোনও গবেষক হয়ত শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের পল্লি চিন্তা নিয়ে গবেষণা করেছেন। আফ্রিকার কোনও তরুণ অধ্যাপক হয়ত তাঁর বিরহের গান নিয়ে গবেষণা করেছেন। রুশ ভাষার কোনও কবি হয়ত তাঁর কবিতার অনুবাদ করেছেন। তাঁরা ডিগ্রি পেয়েছেন, স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাতে আমজনতার কী এল গেল? হরিয়ানার সেই যুবকের কাছে বা মণিপুরের তরুণীর কাছে তো রবীন্দ্রনাথ পৌঁছতে পারেননি।

নিজের গান সম্পর্কে বেশ গর্ব ও ভাল লাগা ছিল বিশ্বকবির। কিছুটা গর্ব করেই বলেছিলেন, আমার অনেককিছুই হয়ত হারিয়ে যাবে। কিন্তু আমার গান বেঁচে থাকবে। স্বীকার করুন আর নাই করুন, বাঙালির কাছে রবীন্দ্রনাথ বেঁচে আছেন কিন্তু ওই গানের জন্যই। কিন্তু এই গানটাই কি আমরা ছড়িয়ে দিতে পেরেছি সারা দেশে? এখন কপিরাইট উঠে গেছে। যে খুশি নিজের মতো করে গাইতে পারছেন, রেকর্ড করতে পারছেন। কিন্তু দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে তাকে কার্যত রুদ্ধ করে রেখেছিল বিশ্বভারতী। কেউ রেকর্ড করতে চাইলে তাঁকে মিউজিক বোর্ডের পরীক্ষায় বসতে হবে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বা মান্না দে–র গান স্বরলিপি মেনে হচ্ছে কিনা তার বিচার করবেন এমন কেউ, যার গান পাড়ার লোকেরাই হয়ত কখনও শোনেনি।

রুশ ভাষায় বা স্প্যানিশ ভাষা অনুবাদ হওয়ার থেকেও বেশি জরুরি ছিল হিন্দি ভাষায় অনুবাদ। ধরা যাক, জাভেদ আখতার বা গুলজারের মতো মানুষকে বলা হল, রবীন্দ্র সঙ্গীতের হিন্দি লিরিক লিখতে। এর জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকও দেওয়া হল। সব গান না হোক,

প্রাথমিকভাবে হয়ত দুশো বা তিনশো গানকে বাছা যেত। সেই অনুবাদগুলোকে সুর অক্ষুন্ন রেখে যদি কিশোর কুমার বা লতা মঙ্গেশকারকে দিয়ে গাওয়ানো যেত! যদি সঙ্গীত পরিচালকদের অনুরোধ করা যেত হিন্দি ছবিতে এইসব গান ব্যবহার করুন। কিছুই কি ফল হত না? কিশোর বা রফির কণ্ঠে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে পারত রবি ঠাকুরের গান। ধরা যাক, ইয়ারানা ছবির ছুঁ কর মেরে মনকো/ কিয়া তুনে ক্যা ইশারা। এই গানটা মনে মনে গান। তারপর গেয়ে দেখুন 'তোমার হল শুরু, আমার হল সারা।' অভিমান ছবির সেই গানটা— তেরে মেরে মিলন কিয়ে র‍্যায়না। তারপর মনে মনে সুর করে গান— যদি তারে নাই চিনি গো সেকি। কিশোরের গাওয়া আরও একটি গান— ম্যায় প্যাসা তু সাওন। এবার মনে মনে গান— এ মণিহার আমায় নাহি সাজে। এমন কত গানে রবীন্দ্র সুর লুকিয়ে আছে। সেগুলো কিশোরের কণ্ঠে জনপ্রিয় হয়েছে। গোটা দেশে ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু লোকে জানলই না এই গানগুলো রবীন্দ্রনাথের গানের আদলে তৈরি।

কিশোর কুমার বাংলায় যে রবীন্দ্র সঙ্গীতগুলো রেকর্ড করেছিলেন, সেগুলো একবার চালিয়ে দেখুন। কী অসম্ভব দরদ দিয়ে গেয়েছিলেন! রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্যাসেট বিক্রির পরিসংখ্যানে একেবারে সামনের সারিতেই থাকবে কিশোরের এই অ্যালবামগুলো। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁকে দিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায় 'চারুলতা' ও 'ঘরে বাইরে'তে খালি গলায় গাইয়েছিলেন। হিন্দিতে এই ঝুঁকিটা নেওয়া গেল না কেন? উদ্যোগটা বিশ্বভারতীর দিক থেকে হতে পারত। ক্যাসেট কোম্পানির দিক থেকেও হতে পারত। অনুবাদক হিসেবে জাভেদ আখতার বা গুলজারের মতো যদি কেউ থাকতেন, হিন্দিতেও আরও জীবন্ত হয়ে উঠতে পারত রবি ঠাকুরের গান। হরিয়ানার সেই কিশোর বা মণিপুরের সেই তরুণীর কাছে অনায়াসেই পৌঁছে যেতে পারত রবীন্দ্রসঙ্গীত। দরকার হলে এইচএমভি বা এই জাতীয় রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তিও করা যেত। এতে গানগুলোও জনপ্রিয় হত। বিশ্বভারতীর ভাঁড়ারে কিছু অর্থও আসত। কিন্তু বিশ্বভারতীর যাঁরা কর্তা ছিলেন, তাঁরা আদৌ এমনটা ভেবে ছিলেন? তাঁরা রবীন্দ্রনা-থকে আগলে রাখতেই বেশি ব্যস্ত ছিলেন।

১৯৯১ সালেই কপি রাইট উঠে যাওয়ার কথা। বিশ্বভারতী আবেদন জানিয়ে আরও দশ বছর সেই মেয়াদ বাড়িয়ে নিল। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথকে আরও দশ বছর খাঁচায় বন্দি রাখল। অবশেষে সেই কপিরাইট শেষ হল ২০০১ সালে। তারপর থেকে যে কোনও ক্যাসেট কোম্পানি চাইলেই রবীন্দ্রনাথের গানের অ্যালবাম করতে পারেন। শান থেকে শানু, বাবুল থেকে হাবুল— অনেকেই করছেন। সেই ক্যাসেট কজন শুনছেন! দু একবার এফএমে বাজছে। হারিয়ে যাচ্ছে।

বড্ড দেরি করে ফেলেছে বিশ্বভারতী। ট্রেনটা মিস হয়ে গেছে। আজ আর চাইলেও সে উপায় নেই। অনুবাদ হয়ত করানো গেল। লতা মঙ্গেশকার জীবনের পশ্চিম সীমান্তে এসেও গান গেয়েছেন। এখন অস্তাচলে। আপনার হাতে আর একটা কিশোর কুমার আছে?

এই গান গেয়ে টাকা নিতে পারব না

রাতুল বিশ্বাস

তারকা সমাগম বলতে যা বোঝায়! ছবিতে কে নেই! উত্তম কুমার, সৌমিত্র চট্টো-পাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ। এঁরা তখনই দিকপাল। তখনও মহুয়া রায়চৌধুরি বা প্রসেনজিৎ সেভাবে তারকা হয়ে ওঠেননি। এমন ছবির হিরো কিনা সুখেন দাস! তিনিই আবার ছবির পরিচালক। সঙ্গীত পরিচালক তাঁরই দাদা অজয় দাস।

কিন্তু ছবির গানগুলো কাকে দিয়ে গাওয়ানো যায়! অজয় দাস চাইছেন, বাংলার চেনা কণ্ঠের বাইরে নতুন কোনও কণ্ঠ! কিশোর কুমার হলে কেমন হয়! প্রশ্নটা ভাসিয়ে দিলেন সুখেন দাস। অজয় দাস তো এক কথায় রাজি। কিন্তু কিশোরের সঙ্গে আলাপটুকুও নেই। এত বাজেটও নেই। কে তাঁকে বম্বে গিয়ে রাজি করাবেন? একেকটা গানের জন্য তিনি তখন অন্তত পনেরো হাজার পারিশ্রমিক নিচ্ছেন। বম্বে যাতায়াতের খরচাও তো কম নয়। কার মাধ্যমে যোগাযোগ হবে?

কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই সুখেন দাস বললেন, এখানে কাউকে ধরলে হবে না। সটান বম্বে চলে যাওয়াই ভাল। তিন চার দিন থাকলে কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই চললেন দুই ভাই। সঙ্গে দুই প্রযোজক। উঠলেন একটা হোটেলে। কিন্তু কীভাবে কিশোর কুমারের কাছে পৌঁছনো যায়! সুখেন দাস আগেই খোঁজ নিয়েছিলেন। সেখানে কিশোর কুমারের ড্রাইভার আবদুলকে ধরতে পারলে কিছু একটা উপায় হয়ে যাবে। আবদুল কিছু না কিছু ব্যবস্থা ঠিক করে দেবে।

আবদুলের সঙ্গে যোগাযোগ হল। হোটেলে ডেকে তাঁকে ঢালাও খাওয়ানো হল। আবদুল বলে গেলেন, আমি তিন-চার দিনের মাথায় ঠিক ডেট ম্যানেজ করে দেব। তিন দিন পেরিয়ে গেল। এদিকে, আবদুল আশ্বাস দিয়েই চলেছেন। শেষমেষ একদিন

আবদুল বললেন, কাল মেহবুব স্টুডিও বুক করে রাখুন। উনি ঠিক পৌঁছে যাবেন। কালই রেকর্ডিং করিয়ে দেব। আলাপ নেই, পরিচয় নেই, কী গান গাইতে হবে, তাও জানেন না। এভাবে রেকর্ডিং হয় নাকি! সন্দেহ হল, কিন্তু এখন আবদুলকে ভরসা করা ছাড়া উপায়ও নেই। আবদুল মাঝে মাঝেই এসে প্রোডিউসারের কাছে টাকা পয়সা নিয়ে যাচ্ছেন। যথারীতি মেহবুব স্টুডিও বুক করা হল। মিউজিসিয়ানদের বুক করা হল। প্রায় হাজার তিরিশেক খরচ। কিন্তু অনেক অপেক্ষার পরেও কিশোর কুমারের দেখা নেই।

কোনও যোগাযোগ না করে এভাবে কেউ কিশোর কুমারের রেকর্ডিং করাতে আসে? যাঁরা ডেট নিয়ে আসেন, তাঁদেরই ভোগান্তির একশেষ থাকে না। কোন সাহসে ভর করে সুখেন দাস বম্বে চলে এলেন! স্টুডিওতেই এই জাতীয় কথা শুনতে হল। হোটেল ফিরে বেশ মনমরা হয়েই রইলেন সুখেন দাস। ঠিক করলেন, পরেরদিন একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বেন।

পরদিন সকালে দু পাত্র চড়িয়ে নিলেন। কারণ, সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় কিশোর কুমারকে দু-চার কথা শোনানো যাবে না। সকালেই হাজির গৌরীকুঞ্জে। গেটের সামনেই তুমুল চিৎকার জুড়ে দিলেন। সাত সকালে কিশোর কুমারের বাড়ির সামনে চিৎকার? কে? কার এত সাহস? ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন অমিত কুমার। সুখেন দাসের সঙ্গে আলাপ না থাকলেও তিনি সুখেন দাসকে চিনতেন। বললেন, আঙ্কেল আপনি! আসুন, ভেতরে আসুন। বলে ড্রয়িং রুমে বসালেন।

উপরে গিয়ে কিশোর কুমারকে কিছু একটা বললেন। কিশোর নিচে নেমে এলেন। সুখেন দাসের মেজাজ তখন সপ্তমে। এক নাগাড়ে বলে গেলেন, আমরা বাংলা ছবি করি বলে কি আমাদের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করবেন? চিরদিন ধরে আমাদের ঝোলাচ্ছেন। কাল আপনার জন্য রেকর্ডিং স্টুডিও ভাড়া করা হল। এতগুলো টাকা গচ্ছা গেল। আপনি এলেন না। আপনি যদি আমার ছবিতে গান করবেন না, সেটা আগে বললেই পারতেন। এভাবে ঝোলানোর কী মানে হয়!

এক নাগাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন। কিশোর বুঝলেন, কিছু একটা গন্ডগোল হচ্ছে। বললেন, সুখেনবাবু আপনি বসুন। কোথাও একটা গন্ডগোল হচ্ছে। আপনি কী বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার কোন ছবি, কী গান, কোথায় রেকর্ডিং, আমি তো কিছুই জানি না।

সুখেন দাস গত চার দিনের সব ঘটনাই

নয় বেশিদিন, এই তো এসেছি আমি, সুখেও কেঁদে ওঠে মন, কী উপহার সাজিয়ে দেব, ওপারে থাকব আমি, আমার এ কণ্ঠ ভরে, চিতাতেই সব শেষ, তুমি মা আমাকে পৃথিবীর এই আলো দেখিয়েছিলে।

এর মধ্যে অমর কণ্টক ছবির একটা গান আলাদা করে উল্লেখ করা দরকার। এই তো জীবন/ হিংসা বিবাদ লোভ ক্ষোভ বিদ্বেষ/ চিতাতেই সব শেষ। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা। অজয় দাসের সুর। ক্যাসেট করে আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিশোর কুমারের ঠিকানায়। রিহার্সালের সময় গানটা গাইতে গাইতে কেঁদে ফেলেন কিশোর কুমার। সেদিনই ছিল রেকর্ডিং। রেকর্ডিংয়ের পর ডাকলেন সুখেন দাসকে। বললেন, এই গানের জন্য আমি টাকা নিতে পারব না। সুখেন দাস জানতে চাইলেন, কেন? কিশোর বললেন, 'আমি জন্মের গান গেয়েছি। এবার মৃত্যুর গানও গাইলাম। এই গানের জন্য আমি কোনও পারিশ্রমিক নিতে পারব না। গানের কথার জবাব নেই। যে শুনবে, সেই কাঁদবে। সত্যি, গৌরীদা গ্রেট।' সুখেন দাস জানালেন, গৌরীদা যখন ক্যান্সারে আক্রান্ত, তখন তিনি এই গান লিখেছিলেন। শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে এল কিশোরের।

একেকটি গানের পারিশ্রমিক ছিল পনেরো হাজার টাকা। সেই সময়ের হিসেবে অঙ্কটা কম নয়। শুধু মাত্র গানটা ভাল লেগেছে বলে এক কথায় ওই টাকা ছেড়ে দেওয়া! এটাও বোধ হয় কিশোর কুমারের পক্ষেই সম্ভব।

খুলে বললেন। কিশোর বললেন, 'আবদুল তো আমাকে কিছু বলেনি। কেন সে এমনটা করেছে, আমি ব্যবস্থা নেব। যা হয়েছে, তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার ছবিতে আমি গান গাইব। ক্যাসেট পাঠিয়ে দেবেন। আর মেহবুব স্টুডিও বুক করে নিন।' ক্যাসেট পাঠিয়ে দেওয়া হল। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই হাজির কিশোর। দুটো গান ছিল। আজ মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ, হয়ত আমাকে কারও মনে নেই। দ্রুত রিহার্সাল সেরে নিয়ে সেদিনই দুটো গানের রেকর্ড হয়ে গেল।

প্রতিশোধ ছবিটা দারুণ হিট করেছিল। তার পেছনে বড় অবদান ছিল কিশোরের ওই দুটো গানের। অজয় দাসের সুর বেশ মন ছুঁয়ে গিয়েছিল কিশোরের। তারপর থেকে দুজনের মধ্যে অদ্ভুত একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। সুখেন দাসের আরও বেশ কয়েকটা ছবির গান গাইলেন কিশোর। প্রায় সব গানই বেশ হিট। কয়েকটা এখানে উল্লেখ করা যাক। আর তো

জিন্দেগি কা সফর

কুন্তল আচার্য

তখন সবে ফিল্মে হাত পাকাচ্ছেন। পরিচালকের যা হয়, যাই দেখেন, তাই নিয়েই সিনেমা বানাতে ইচ্ছে করে। সন্দীপ রায়ের ইচ্ছে হল, কিশোর কুমারকে নিয়ে যদি কোনও ছবি বানানো যায়।

গাঙ্গুলি পরিবার আর রায় পরিবারের সম্পর্ক অনেকদিনের। সত্যজিৎ রায়কে মানিকমামা বলতেন কিশোর। মাঝে মাঝেই আসতেন। বম্বে গেলে সন্দীপ উঠতেন কিশোর কুমারের বাড়িতেই। অমিতের সঙ্গে গল্প আড্ডায় কেটে যেত রাত। কাছ থেকে দেখেছেন কিশোরের নানা কর্মকান্ড। একদিন ছবি করার কথা অমিত কুমারকে বলেই ফেললেন। অমিত বললেন, বাবা যা ব্যস্ত মানুষ, বাবাকে নিয়ে ছবি করা মুশকিল।

ইচ্ছেটা মনের মধ্যে থেকেই গিয়েছিল। হঠাৎ করেই কার্যত বিনা নোটিশে চলে গেলেন কিশোর। সন্দীপ রায় নেমে পড়লেন তথ্যচিত্রের কাজে। গেলেন একের পর এক দিকপাল মানুষের কাছে, যাঁরা কাছ থেকে দেখেছেন কিশোরকে। ছবির নাম 'জিন্দেগি কা সফর'। ইউ টিউবে বিভিন্ন অংশ চাইলেই দেখা যায়। সেই ছবিতে ক্যামেরার সামনে কে কী বলেছিলেন ? আসুন, একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক ।।

সত্যজিৎ রায়

আমার চারুলতা ছবিতে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। খালি গলায় কিশোরকে দিয়ে রেকর্ড করাব ভাবলাম। ওকে বলতেই এক কথায় রাজি। তবে একটাই শর্ত, ও বলল রেকর্ড বম্বেতে হলে ভাল হয়। তাই হল। বম্বেতেই রেকর্ডের ব্যবস্থা করলাম। কিশোরকে আবার গাওয়ালাম। এবার ঘরে বাইরে ছবিতে। সেখানে তিনটি রবীন্দ্র সঙ্গীত। একটা কথা সবার জানা দরকার। এই গানগুলি গাইতে কিশোর এক টাকাও নেয়নি।

সেই শুরু, তারপর স্টেজেও মাতিয়ে গেলেন দেশের নানা প্রান্তে, এমনকি দেশের বাইরেও। কিশোরদাকে নিয়ে যদি সত্যিই কোনও ইতিহাস লেখা হয়, তাতে আমার নামও থাকবে। আমিই তো প্রথম স্টেজে গাইয়েছিলাম।

সুনীল দত্ত

সিনেমা করতেন, প্লে ব্যাক করতেন। আমার মনে হল, এই লোকটাকে দিয়ে যদি মঞ্চে গাওয়ানো যায়, তাহলে কেমন হয়। বললাম, গুরুজি, একবার ভাবুন তো, পাহাড়ে বরফের উপর দাঁড়িয়ে জওয়ানরা আপনার গান শোনে। তারা যদি আপনাকে সামনে থেকে দেখে, তাহলে কত ভাল হয়! কিছুটা নার্ভাস ছিলেন। রিহার্সাল হল। নিয়ে গেলাম নাথুলা সীমান্তে। আমি বললাম, আমি সামনে থাকি, আপনি পেছনে দাঁড়িয়ে গেয়ে যান। কিশোরদা ধরলেন, ‘মেরে সামনে ওয়ালি খিড়কি মে / এক চাঁদ সা টুকড়া র‍্যাহতা হ্যায়’।

জওয়ানরা ভাবছিল, হয়ত আমিই গাইছি। অমনি আমি সামনে থেকে সরে গেলাম। কিশোরদাকে দেখে সে কী হাততালি! থামতেই চায় না। কিশোরদা বললেন, এত ঠান্ডায় জওয়ানরা দাঁড়িয়ে আছে, আমি গান গাইতে পারব না! একের পর এক গান গেয়ে শোনালেন।

কল্যাণজি

স্টেজ শো করার ব্যাপারে কিশোরদাকে অনেকবার বলেছি। উনি বারবার বলেছেন, এত লোক থাকবে। তাদের সামনে গান গাওয়া সম্ভব নয়। তাঁকে বোঝালাম, আপনি কাদের ভয় পাচ্ছেন ? যারা দর্শকাসনে বসে থাকবে, তারা কেউ তো আর গুলাম আলি, লতা মঙ্গেশকার বা মহম্মদ রফি নয়। আপনি তাদের ভয় পাচ্ছেন? কথাটা ওর মনে ধরল। বললেন, গাইব। এমন গাইলেন, সবাইকে পাগল করে দিলেন।

সলিল চৌধুরি

কিশোরের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে ভারি মজার একটা কান্ড ঘটেছিল। কিশোর আর লতার একটা ডুয়েট গান ছিল। কোনও একটা কারণে লতাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। বোধ হয়, বাইরে ছিল। রেকর্ডিং-য়ের ডেট ঠিক করা যাচ্ছিল না। কিশোর বলল, দাদা একটা উপায় আছে। আমি যদি লতার গানটা গেয়ে দিই! যদি মেল, ফিমেল দুটো ভয়েসই আমার থাকে! আমি ভাবলাম, হয়ত মজা করছে। পরে বুঝলাম, ও সত্যি সত্যিই এমন প্রস্তাব দিচ্ছে। বললাম, ঠিক আছে। গেয়ে দেখাও। আমাকে অবাক করে দিল। ও সত্যি সত্যিই মেয়ের গলায় গাইল। সিনেমায় দুটো কণ্ঠই ছিল কিশোরের। দুটো একসঙ্গে গেয়েছিল। এটা বোধ হয় ওর পক্ষেই সম্ভব।

আর ডি বর্মন

বাবার কাছে আসতেন। আর আমার সঙ্গে গল্প করতেন। বলতেন, পঞ্চম, এই লোকটা চলে গেলে আর এমন লোক পাওয়া যাবে না। বাবার সুরে কিশোরদার শেষ গান ছিল মিলি ছবিতে – 'বড়ি শুনি শুনি হ্যায়।' কিন্তু রেকর্ডিংয়ের আগেই বাবা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। কিশোরদা দেখতে গেলেন। বাবার হাতটা ধরে বললেন, কাল রেকর্ডিং। দেখবেন কেমন গাই। সত্যি সত্যিই দারুণ রেকর্ডিং হল। কিন্তু বাবাই শুনে যেতে পারল না ।

অশোক কুমার

মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত কান্ড ঘটাত। কেউ হয়ত কখনও ওকে কিপটে বলেছিল। ও পাল্টা কিছু বলেনি। একবার সবাইকে বলল, চলো অজন্তায় ঘুরে আসি। ওর নাছোড়বান্দা আবদার। না গিয়ে উপায় নেই। শুধু আমরা নই, মোট বারোটা পরিবারকে নিয়ে গেল। নিজেই গাড়ি ভাড়া করল। যাদের গাড়ি ছিল, তাদের গাড়িতে পেট্রোল ভরে দিল। দশটা গাড়িতে করে আমরা গিয়েছিলাম। অজন্তায় হোটেলের ঘর ও আগেই বুক করে রেখেছিল। সবাইকে অজন্তা ঘোরাল, ইলোরা ঘোরাল। কাউকে কোনও খরচা করতে দিল না। ফিরে আসার পর বলল, এবার থেকে আমাকে আর কেউ কিপটে বলবে না।

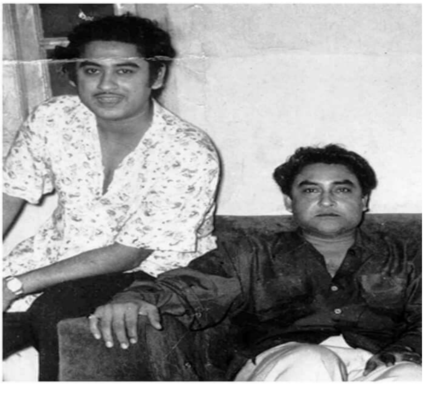

ভ্রমণ

পলাতক হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা

শান্তনু দেশাই

ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে ঝমঝম করে একটা ব্রিজ পেরোলো ট্রেনটা। নদীর নাম দেখলাম ডায়না। ভারী সুন্দর তার গড়ন। জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ গো তুমি বিদেশি নাকি? কলকলিয়ে হেসে বললো কেন গো? নদীর আবার দেশ বিদেশ হয় নাকি?

আমাদের তো সারা বিশ্ব এক দেশ। সকলেই আমরা কারো না কারোর সঙ্গে জড়িয়ে আছি। তোমরা নিজেদের মত করে ভাগ করে নিয়েছ।

লজ্জায় পড়ে গেলাম। সত্যি তো আমরাই বিশ্বকে বিভাজিত করেছি।

ট্রেনটা দাঁড়িয়ে গেল কিছুক্ষণ। ভালোই হোল। আমি ডায়নার সাথে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করার সুযোগ পেলাম। ডায়না, তিস্তা, তোর্ষার খোঁজ নিল। আমাকে সুধালো কোথায় যাচ্ছি।

বললাম কোথাও নয় গো। এমনি অলস ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ডায়না বললো, ও, পলাতক ছবির রেশ নাকি !

নাঃ, সে আর পারি কই।

ট্রেন হুইসেল বাজিয়ে দুলে উঠল। ডায়না কে বিদায় জানিয়ে এগিয়ে চললাম। জানালার বাইরে সরে সরে যাচ্ছে দৃশ্যপট। আমার কল্প জগৎ সারাক্ষণ অনুরিত হচ্ছে সেই চলমান দৃশ্যের।

আমি একটু বেশিই কল্পনা প্রবণ।

কৈশোর বয়সেও সাহিত্য পরীক্ষায় বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ, নিয়মানুবর্তিতা, বা

কোনও মনীষীদের অবদান রচনা ছেড়ে আমি একদম শেষে থাকা একটি বট গাছের আত্মকথা বা একটি নদীর আত্মকথা লিখতে পছন্দ করতাম।

কলেজে নীরস লেকচারের ফাঁকে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের ঘুরপাক খেয়ে ওঠা ধোঁয়ার কুন্ডলী দেখে বিভোর হয়ে যেতাম।

সেই কল্পনার কলতান ইদানিং একটু কমেছে সাংসারিক চাপের কারণে। মনের চাতালে শ্যাওলা জমেছে।

তবু আজও সুযোগ পেলেই মন উড়ি উড়ি।

ট্রেনের আরামপ্রদ চেয়ারে প্রায় সকলেই মুঠো ফোনে মগ্ন। জানি না কি দেখেন, শোনেন। ট্রেনের জানালার বাইরে তখন একটা ছোট্ট গ্রাম। অনেক সুপারি গাছ, দরমার বেড়া দেয়া গোয়ালঘর। টিনের চালা দেয়া দু কামরার ঘর থেকে ধোঁয়া উঠছে। হয়তো কেউ কাচি মাছের বাটি চচ্চড়ি বসিয়েছে। ঝাল ঝাল কুল লঙ্কা দিয়ে সে বড় লোভনীয়।

বেশ কদিন ধরেই এদিকে তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। খাল বিল গুলো ভর ভর। তাতে কয়েকজন বাঁশের ঘনি দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টায়। আনারস ক্ষেতে জল ঢুকেছে। একটা মন্দির জেগে আছে। তার চাতালে দুইজন বসে।

ভাবি ওরা কি নিয়ে কথা বলছে।

ডবল ডোজ, বুস্টার, নিউ ভ্যারিয়েন্ট এইসব শব্দ কি ওদের জানা?

সেভক স্টেশন এ বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে।

আমাদের শহুরে স্বাচ্ছন্দের বলি কয়েক হাজার গাছ।

শুধুই কি গাছ? তাতে থাকা কত পতঙ্গ, পাখি ? ওরা কোথায় যাবে ?

কতদিন জোনাকি দেখিনা।

রাঙারুনে হোম স্টের বারান্দায় বসে দূরে আলোকমালায় সজ্জিত দার্জিলিং শহরকে দেখে জোনাকি দেখার স্বাদ মেটাই।

আমরা খুব হিংস্র।

ভাবনায় ছেদ পড়ে হকারের ঝালমুড়ির আওয়াজে। কি সুন্দর সাজানো।

কিন্তু আমি যে সব কিছু সাজানো পছন্দ করিনা। একটু অগোছালো থাকাও ভালো। সাজানোর সুযোগ থাকবে তো।

এই দেখোনা সাজানো কাশ্মীর ভ্রমণ করতে গিয়ে মনটা একদম অগোছালো হয়ে গেল। হৈ হট্টগোল, দৌড়াদৌড়ি করে বেহাল।
অশান্ত মনকে শান্তি দিতে তিনদিনের ছুটিতে চলে এলাম বর্ষার দার্জিলিংয়ে।
কোনও তাড়াহুড়ো নেই, কোলাহল নেই।
টিপটিপ বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় অলসভাবে লেবঙ কার্ট রোড, ভুটিয়া বস্তি, মহাকাল মন্দির ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।
চাইনি তবু সে দেখা দিল।
গুনগুন করে গান শোনালাম... আমি আপন করিয়া চাহিনি তোমারে, তুমি তো আপন হয়েছো।
লাজুক হেসে মেঘের চাদরে ঘোমটা দিল।
এই বেশ।
রোহিনীর রাস্তা ধরে শেয়ার জিপে যখন আসছিলাম তখনই চোখে সবুজের আস্ত-রণ ঘন হয়ে লেপ্টে গিয়েছিল।
জোড় বাংলো নেমে উল্টোদিকের রাস্তা ধরে তিন মাইল এসে যখন রাঙ্গারুন এর রাস্তা ধরলাম সে সবুজ আপ্লুত করে দিল।
কোথাও ঈষৎ হলুদাভ, কোথাও গাড় সবুজের শেড। জনমনিষ্যির চিহ্ন মাত্র নেই সারা রাস্তা জুড়ে।
ট্রেকার্স হাট, খালিঙ্গ হোম স্টে পেরিয়ে আশ্রয় নিলাম নিলম হোম স্টে তে।
ছোট্ট ছিমছাম ঘর বারান্দা। রাঙারুন এর চা বাগান এই অঞ্চলের সবথেকে প্রাচীন।
দুঃখের বিষয় চা কারখানা টি বন্ধ। পূর্বের শ্রমিকরা কেউ দূরের বাগানে কাজ নিয়েছে, কেউ ঘরের সামনে দোকান করে দিন গুজরান করে।
পায়ে হেঁটে ঘুরতে বেশ লাগছিল।
কিছুটা দূরেই লাকপা হোম স্টে। সবথেকে সেরা লোকেশন। ঘর থেকেই চা বাগান সহ টাইগার হিল, দার্জিলিং শহর দৃশ্যমান।
গাঁয়ের নীচে নদী। অন্য সময় জল থাকেনা।
নদী পেরিয়ে পাহাড় চড়ে টি এন রোড ধরে দার্জিলিং যাওয়া যায়।
আমার সে আশায় জল ঢেলে দিল নদী। জল বিপদজনক ভাবে বয়ে চলেছে। পারাপার মুশকিল।
পরদিন রাঙারুন কে বিদায় জানিয়ে চলে এসেছিলাম দার্জিলিং।
আস্তাবল পেরিয়ে ম্যাল থেকে একশ মিটার দূরে সস্তার হোটেলে এক রাত কাটিয়ে নেমে গিয়েছিলাম শিলিগুড়ি।
ভবঘুরের মত ইচ্ছে নিয়ে কোনও গন্তব্য রাখলাম না। সকালের ট্রেন ধরে ডুয়ার্সের ঘন সবুজ গায়ে মেখে, চোখে লেপটে পৌছেছিলাম আলিপুরদুয়ার।
খানিক বিশ্রাম আর দুপুরের ভোজন সেরে ফিরতি পথে ডুয়ার্স রানী কাঞ্চন কন্যা ধরে বাড়ির পথে পা বাড়ানো।
রাজাভাতখাওয়া স্টেশন এর পাশে নুড়ি পাথরের খাঁজে অনেক অনেক প্রজাপতি উড়ছে, বসছে ঘুরছে। কিতাবি ভাষায় মাড পুডলিং বলে।
ওরা ডাক দিল, আসবে না?
বললাম, আসবো আর একদিন,
আজ যাই।

কোনও বুকিং ছাড়াই হাজির পাহাড়ি গ্রামে

শুভেন্দু দেবনাথ

বেঙ্গল টাইমসে বেড়ানোর নানারকম কাহিনী পড়ি। বেশ লাগে। আমার নিজের একটা বেড়ানোর গল্প শেয়ার করতে ইচ্ছে করছে।

বছর তিনেক আগেকার ঘটনা। দার্জিলিঙে গিয়েছিলাম। ঠিক ভাল লাগছিল না। তিনজনের টিম। দুদিনেই অনেকটা ঘোরা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল, এবার অন্য কোথাও গেলে কেমন হয়। হাতে তখনও তিনদিন। কারণ, তিনদিন বাদে ফেরার টিকিট। এই তিনদিনে কোথাও একটা যাওয়াই যায়।

দুই বন্ধু একমত হলাম, কার্শিয়াংয়ের কাছে ডাউহিলে গেলে কেমন হয়! জায়গাটা দারুণ, কিন্তু থাকার জায়গার অভাব। একটা ফরেস্টের বাংলো আছে। কিন্তু বুকিংয়ের হাজার ঝামেলা। ডিএফও-কে ফ্যাক্স করতে হবে। তারপর কবে তার রিপ্লাই আসবে, কে জানে! উত্তর ইতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনাও কম।

হঠাৎ, চোখে পড়ল দার্জিলিং ডিএফও-র অফিস। সাহস করে ঢুকেই পড়লাম। নিজেদের ইচ্ছের কথা জানালাম। উনি বললেন, এটা তো আমার কিছু করার নেই। ওটা কার্শিয়াং ডিএফও-র আন্ডারে পড়ছে।

তাঁকে বললাম, অতশত জানি না। আপনিই কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমরা চেষ্টা করলে হবে না, এটুকু জানি। আপনি চেষ্টা করলে হতেও পারে। একটু চেষ্টা করে দেখুন না।

উনি বললেন, কাল আসুন। আমি দেখে রাখব। যথারীতি পরের দিন গেলাম তাঁর দপ্তরে। বললেন, ‘ওখানে এখন মেরামতি হচ্ছে। আপনারা বরং মিরিক চলে যান।’ কেন জানি না, মন সায় দিল না। আগেও মিরিক গেছি। আলাদা করে দুদিন থাকার মানে হয় না।

অগত্যা সেইদিনই একটা গাড়ি ধরে নেমে গেলাম। ঠিক করলাম, কার্শিয়াংয়ে নামব। তারপর আশেপাশের কোথাও একটা জায়গা ঠিক খুঁজে নেব। গাড়িতেই একজনের সঙ্গে গল্প হচ্ছিল। আশেপাশে কোথাও রেয়ার স্পট আছে কিনা। তিনি বললেন চিমনির কথা। কাকে একটা ফোন করে নম্বরও জেনে নিলেন।

ফোন করা হল। যিনি ধরলেন, তিনি সটান জানিয়ে দিলেন রুম খালি নেই। কী আর করা যাবে। মন মরা হয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ, মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি চেপে গেল। মনে হল, চিমনির সেই ভদ্রলোককে আবার ফোন করি। করলাম। শুরুতেই বললাম, দেখুন, আমি জানি আপনি বলবেন রুম নেই। আপনার ‘না’ শোনার জন্য ফোন করিনি। আমরা আসছি। আপনি ব্যবস্থা করন। এটা বলার জন্য ফোন করেছি।

উনি তো ঘাবড়ে গেলেন। আমতা আমতা করে হিন্দি –নেপালি মিশিয়ে বলতে চাইলেন, রুম নেই। আমরাও নাছোড়। বললাম, শুনুন ভাইয়া, এতদূর থেকে যখন এসেছি, তখন ফিরে যাব না। আমরা থাকব, ব্যাস। কোথায় রাখবেন, সেটা আপনার ব্যাপার। আমরা রান্নাঘরেও থাকতে পারি। ডাইনিংয়েও থাকতে পারি। আপনার ঘরেও থাকতে পারি। আপনি বরং এক–দু রাতের জন্য অন্য ঠিকানা খুঁজে নিন। কোনও বন্ধু বা আত্মীয়র বাড়িতে চলে যান।

এমন আজগুবি আবদার সে নিশ্চয় এই জন্মে শোনেনি। কার্শিয়াং থেকে একটা আলাদা গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম চিমনির দিকে। অনেকটাই ডাউহিলের রাস্তায়। ইচ্ছে ছিল

একবার ডাউহিলে নামার। কিন্তু এমন বৃষ্টি, নামার সুযোগ হল না। গাড়ি চলল চিমনির দিকে। গিয়ে থামল সেই হোম স্টে-র সামনে।

চমৎকার হোম স্টে। পুরোটাই প্রায় ফাঁকা। মালিক বেরিয়ে এলেন। বললাম, এসে গেছি। এবার ব্যবস্থা করুন। উনি একটা সুন্দর ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললেন। বললাম, ‘পুরোটাই তো ফাঁকা, তাহলে যে বললেন রুম নেই।’ উনি কিছুটা লজ্জায় পড়ে গেলেন। বললেন, আসলে এক-দুটো রুমে লোক রেখে লাভ হয় না। সেই এক-দুজনের জন্য রান্না করতে হয়। এক সঙ্গে অন্তত তিন-চারটে রুমে বুকিং থাকলে সুবিধা হয়। সেই কারণেই বলেছিলাম, রুম নেই।

তাঁর সমস্যাটা বুঝলাম। তিনি যে সত্যিটা বললেন, সেটা জেনে ভালও লাগল। আমরা আপাতত দুদিনের অতিথি। কিন্তু আকাশের যা অবস্থা, সারাক্ষণ বৃষ্টি। বৃষ্টিটা দারুণ ভাবে উপভোগ করেছিলাম। প্রাণখুলে আড্ডা দিয়েছিলাম। কত গান গেয়েছিলাম। কত পুরানো স্মৃতি হাতড়েছিলাম। আর মাঝে মাঝেই ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ছি। এর তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিচ্ছি। দ্বিতীয় দিন একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আশপাশের এলাকাটা ঘুরে দেখলাম। রাস্তাটা তখন একেবারে এবড়ো খেবড়ো ছিল। শুনলাম, কয়েকদিন পরেই নাকি ঠিক হয়ে যাবে। জানি না, আজও ঠিক হয়েছে কিনা।

ওই দুর্গম পাহাড়ি পথেও ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। যাওয়াটা না হয় সহজ। নেমে গেলেই হয়। কিন্তু কার্শিয়াং থেকে হেঁটে ফিরে আসছে! সত্যিই পেন্নাম করতে ইচ্ছে হল। আমরা যদি এই দুর্গম এলাকায় থাকতাম, কোনকাল লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিতাম। ড্রপ আউটের তালিকায় আমাদের নামগুলো জ্বলজ্বল করত।

সবমিলিয়ে দুদিনের ট্যুরটা

মন্দ হয়নি। মাঝে মাঝে রোদ। মাঝে মাঝে বৃষ্টি। গ্রাম্য কিছু দোকান। ইচ্ছেমতো মোমো, সিঙ্গাড়া খাওয়াই যায়। কতরকম ফলের গাছ। গোটা গ্রামটাই যেন নিজেদের গ্রাম। যেন যার ঘরে যখন খুশি ঢুকে পড়া যায়। ইচ্ছে হল, একজনের বাড়িতে চা খাব। এক আন্টিকে বলামাত্রই হাসিমুখে রাজি। তিনি চা করে আনলেন। চা-টা যে দারুণ এমন নয়। কিন্তু ওই আতিথেয়তা! সত্যিই তুলনা হয় না। মানুষগুলো কত সহজ-সরল। একবার ভাবুন তো বেহালায় বা বরানগরে কোনও বাড়িতে গিয়ে আপনি চা খেতে চাইছেন। ইভটিজার বা চোর ভেবে গণপিটুনিও জুটে যেতে পারে। অথচ, ওঁরা কত সহজ-সরল। কত অতিথি বৎসল। ওঁদের ওই হাসিমুখগুলো দেখে আমাদেরও যেন আবদার করতে সংকোচ হয় না।

আবার যদি কখনও সুযোগ পাই, সেই গ্রামে যাব। জানি না, কখন যাওয়া হবে। যাঁরা এই লেখা পড়ছেন, তাঁরা চাইলে ঘুরে আসতে পারেন। নেটে চিমনি লিখে সার্চ মারলেই অনেক ছবি, তথ্য পেয়ে যাবেন। দুটো দিন নিরিবিলি পাহাড়ি গ্রামে ঘুরে আসতে চাইলে আপনার ঠিকানা হতেই পারে চিমনি।

বেড়ানোর এমন নানা বিচিত্র গল্প আপনিও তুলে ধরতে পারেন। বেঙ্গল টাইমসে লিখে পাঠিয়ে দিন আপনার অভিজ্ঞতা। লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

bengaltimes.in@gmail.com

বেঙ্গল টাইমস

bengaltimes.in

আমি যে গান গেয়েছিলেম

ISSN 2445 5657